যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

কলকাতাকে পরিচ্ছন্নতায় ‘মডেল শহর’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছে বর্তমান পুরসভা। নিয়মকানুনও তৈরি হচ্ছে কত। ‘হাত ধোয়া দিবস’ থেকে ‘জঞ্জাল পরিষ্কার দিবস’—সবই দেখেছে এই শহর। এসব নাকি মানুষের সচেতনতা বাড়াবার জন্যই প্রশাসনের উদ্যোগ। কথায় আছে, নিয়ম তৈরিই হয় ভাঙবার জন্য। ভোটের সময় নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার হয় রাস্তার ধারের দেওয়ালগুলো। ভোটে জিতে দল ক্ষমতায় চলে এলেও দেওয়ালগুলো একইরকম থেকে যায়। যদিও, ক্ষমতার চোখে কিন্তু এগুলো অনৈতিক নয়...।

ফোটো: **আশিসকান্তি সোম** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

সঞ্জীব খান (সিনেমাটোগ্রাফার)

এক কথায় বললে কলকাতা কলকাতাই। কলকাতার মধ্যে একটা অদ্ভুত জাদু আছে। কলকাতার সেই বাগবাজার ঘাট, সেই বৈঠকখানা রোড সেই কুমারটুলির স্বাদ একেবারে আলাদা। কলকাতাকে চিনতে গেলে কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরতে হবে। যেহেতু আমি ছবি তুলি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি, কলকাতার একটা নিজস্ব রং আছে। কলকাতাকে লেন্সে ধরতে গেলে সবার আগে কলকাতাকে ফিল করতে হবে।

আমার প্রথম কলকাতা দেখা বলতে বড়বাজার, সে অনেককাল আগের কথা। ওখানেই প্রথম কাজ করতাম। সেই সময় থেকেই ছবি তোলার সূত্রপাত আর হ্যাঁ, তখন থেকেই একটা জিনিস ফিল করেছি যে কলকাতার মধ্যেই অনেকগুলো কলকাতা আছে। ঠিক যেমন ’রাজাবাজার টু রাজারহাট’— এই নামে পরবর্তীতে একটা ছোট ছবিও করেছিলাম মূলত অ্যানথ্রোপলজি-বেসড। তো এই দুটো দেখা একেবারে অন্যরকম। কোথায় ঝাঁ-চকচকে রাজারহাট-নিউটাউন আর কোথায় রাজাবাজার তিলজলা খিদিরপুর— এই ভেরিয়েশনটাই কলকাতা। কলকাতা সবাইকে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার আজকাল লক্ষ করছি কলকাতা থেকেও মধ্যবিত্ত সমাজটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, যার প্রমাণ প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো কলকাতার বড় বড় হাইরাইজগুলোর পেছনেই গড়ে উঠছে বড় বড় বস্তি। আমার মনে হয় কলকাতাকে আরও একটু অর্গানাইজড হতে হবে। আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং সেটা ছাড়া সার্বিক ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয়। প্রসাশনের দায়িত্ব নিয়েও এ-ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়।

মিডিয়াতে যখন প্রথম কাজ করতাম সেই সময়ের কলকাতাটা অনেক অন্যরকম ছিল। ছবি তোলার কাজেই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর ঘুরেছি, কিন্তু কলকাতার মধ্যে যে প্রাণটা পেয়েছি সেটা আর কোথাও নেই। কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ তাদের মতো করে থাকেন। আসলে কলকাতা সবাইকে আপন করে নিতে পারে। এটা ঠিক, অনান্য শহরের তুলনায় কলকাতা সেইভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। *এরপর সাতের পাতায়*

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

জৌলুসই তো শেষ কথা বলে...

তমাল ভৌমিক

পুজো মানে একটা অন্যরকম গন্ধ। পুজো মানে একটা খুশির আমেজ। তবে এই পুজো আমাদের মতো ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের কাছে যতটা আনন্দের, বেদনার ততটাই। তার প্রধান কারণ পকেটের টান। সারা বাড়িসুদ্ধ লোক শুধু নয়, বউয়ের দিদির মেয়ে, দাদার ছেলে, মাসতুতো বোনের ভাসুরের ছেলে অবধি লিস্ট যখন গড়াতে থাকে কেন যেন মনে হয় হৃদ্‌পিণ্ড মিনিটে কয়েকশো গুণ কম্পন বাড়িয়ে দিয়েছে। সকালে যুদ্ধে যাবার মতো সরঞ্জাম গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া, ফের রাতে ফিরে কোনওরকম খেয়ে দেয়ে ঘুম, আবার পরদিন সেই এক রুটিন এই যাদের জীবন সেখানে আর এই স্টেটাস নামক বিলাসিতা কতক্ষণ ভালোলাগে। আর তারপর তো অফিসে পান থেকে চুন খসলে বসের বাপ-বাপান্ত রয়েইছে।

রথীনদা আর আমি পাশাপাশি অফিসেই চাকরি করি সেক্টর ফাইভে। তাই একই সাথে যাতায়াত করি। সেদিনও অন্য দিনের মতোই অফিস গেছি একসাথে; আমাকে বললেন, আজ তো হাফ ডে, চলো সামনে পুজোও আসছে কিছু কেনাকাটা করে আসি। আমার মাইনে কম হলেও চারটে প্রোমোশন পেয়ে, তার পকেট ইদানীং গরম থাকে। শপিংমলে রথীনদা একটার পর একটা জিনিস পছন্দ করে আর ট্রায়াল রুমে ঢোকে, আমি বাইরে বিদূষকের মতো দাঁড়িয়ে। ট্রায়াল রুমের দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেন, এটা দারুণ না; আর আমি হাসি হাসি মুখ করে বলি, একদম।

কেনাকাটা সেরে ফেরার সময় ট্রেনে উঠেছি, জায়গাও পেলাম দু’জন। তবে এই জার্নিতে এমন একটা ঘটনা ঘটলো তা আমি কোনওদিন ভুলতে পারবো না। কিছুদূর যেতেই এক হকার উঠল রুমাল বিক্রি করতে। রথীনদা বললেন, সবই তো কেন হল ভাই নতুন একটা রুমালও নিয়ে নিই। আমিও সায় দিলাম। রুমালওয়ালাকে ডাকা হল। রথীনদা একটা রুমাল পছন্দ করল। এবার শুরু হল

বিপত্তি। রুমালওয়ালা রুমালটির দাম চল্লিশ টাকা বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে রথীনদা যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, তোমরা এই হকাররা দু’টাকার জিনিসকে দশ টাকায় বেচবে এই তো তোমাদের ধান্দা। কুড়ি টাকার এক টাকাও বেশি দেব না।

বেচারা হকার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, দাদা এই দামে দিতে পারব না, লস হয়ে যাবে। অমনি রথীনদা বলে বসলেন, রাখো তোমার রুমাল বড়বাজারের ফুটপাথে এসব দশ টাকায় বিক্রি হয়। আমাকে বললেন, এইসব আজেবাজে হকারেই দেশটা ভরে গেছে। আমি চুপচাপ শুনলাম। অথচ আমি জানি যে পাঁচশো টাকার জামা তিনি কিছুক্ষণ আগেই শপিংমল থেকে হাজার টাকায় কিনে আনলেন। আসলে এই গরিব হকারের কী-বা দোষ, জৌলুসই তো শেষ কথা বলে...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

ঘোরাঘুরি @ কলকাতা

রবীন্দ্র সরোবর

নেহা প্রধান

শহর কলকাতার এক অদ্ভুত মাদকতাময় আকর্ষণ লুকিয়ে আছে এখানকার রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অলি-গলিতে। যতই ধুলোবালি, ইট-কাঠ-কংক্রিটের রাজত্ব কায়েম হোক তবু প্রেমিকের চোখে তিলোত্তমা কলকাতা রয়ে যায় কলকাতাতেই। প্রেমের কথা যখন উঠলই তখন চলুন আজ ঘুরে আসি রবীন্দ্র সরোবর। উত্তরে সাদার্ন অ্যাভিনিউ, পশ্চিমে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, পূর্বে ঢাকুরিয়া এবং দক্ষিণে সাউথ সাব-আর্বান রেলওয়ে লাইনের মাঝের অঞ্চলে অবস্থিত সবুজে ছাওয়া রবীন্দ্র সরোবরকে (পূর্বতন ঢাকুরিয়া লেক) দক্ষিণ কলকাতার আত্মা বলা হয়। আর হবে নাই-বা কেন, ৭৩ একরের সুবিশাল হ্রদ এবং হ্রদের চারপাশে গাঢ় সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা সুসজ্জিত উদ্যান সংবলিত এলাকা প্রকৃত অর্থেই শহরবাসীর অন্যতম অক্সিজেন সরবরাহকারী।

১৯২০ সালে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (সংক্ষেপে সিআইটি) ১৯২ একরের বিস্তীর্ণ জলাজমি অঞ্চলকে বাসোপযোগী করে তোলার জন্য কাজ শুরু করে। কেন্দ্রস্থলে একটি হ্রদের পরিকল্পনা করা হয়। শুরু হয় হ্রদের খননকার্য। ধীরে ধীরে চারপাশে গড়ে তোলা হয় রাস্তাঘাট, বসতবাড়ি, শিশু উদ্যান, অডিটোরিয়াম, পার্ক ইত্যাদি। লেকের ধারে বিভিন্ন প্রজাতির গাছগাছালি সংগ্রহ করে লাগিয়ে সুসজ্জিত হাঁটাপথ, ঘাসে ঢাকা লন, বসার জায়গা তৈরি করা হয় অচিরেই। ১৯৫৮ সালে ঢাকুরিয়া লেকের নতুন নামকরণ হয়— রবীন্দ্র সরোবর। লেকের পশ্চিম প্রান্তে ১৯২০ সালে খননের সময় মাটির তলায় পাওয়া দুটি কামান সংরক্ষিত আছে। কথিত যে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সময়কালে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল এগুলি। এখানে বর্তমানে ১০০ বছরেরও পুরনো বড় বড় প্রচুর গাছ যত্নের গুণে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। ২০১২ সালে পাওয়া একটি তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৫০টি প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ রয়েছে লেক-সংলগ্ন এলাকা জুড়ে। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের সমাগম উপলক্ষে বহু পক্ষীপ্রেমিক এবং উৎসাহী জনতা আসেন রবীন্দ্র সরোবরে।

আপনি কলকাতার যেখানেই থাকুন না কেন, রবীন্দ্র সরোবরে পৌঁছনোর জন্য বেশি বেগ পেতে হয় না। সরাসরি মেট্রো ধরে নেমে পড়ুন রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে। কিংবা শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে নামুন সরোবরের উলটোদিকে টালিগঞ্জ স্টেশনে। এছাড়াও বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি তো আছেই। আসতে পারেন সপরিবারে, সবান্ধবে দল বেঁধে আড্ডা দিতে অথবা যুগলে একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে। ভোরবেলা এবং বিকেলের দিকে অনেকেই লেকের ধারে হাঁটতে আসেন এবং প্রাণায়াম, শরীরচর্চা করেন। সরোবরের উপর দিয়ে বয়ে আসা শীতল হাওয়ায় সত্যিই যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অতি মনোরম পরিবেশের দৌলতে রবীন্দ্র সরোবর একটি জনপ্রিয় শুটিংস্পটও বটে। তাই এখানে দৈবাৎ দেখা পেতেই পারেন ছোট বা বড়পর্দার কোনও সেলিব্রিটির।

হ্রদের ধারঘেঁষে রয়েছে সুদৃশ্য ফোয়ারা, ছোট ছোট বাগিচা, ফুলের কেয়ারি, বসার জায়গা। গাছের ছায়ায় ঢাকা সবুজ ঘাসজমিতে বসে হ্রদের জলে মেঘের প্রতিচ্ছবি, রাজহাঁস, পানকৌড়ি, মাছেদের লুকোচুরি দেখতে দেখতেই কখন সময় কেটে যাবে আপনি টের পাবেন না। হ্রদের মাঝের দ্বীপগুলিতে সহজেই পৌঁছানোর জন্য রয়েছে ছোট ছোট সেতু। তবে বর্তমানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সরোবরের উদ্যানে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে প্রবেশের অনুমতি নেই।

সরোবর কমপ্লেক্সের উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলি ছোট-বড় স্যুইমিং ও রোয়িং ক্লাব রয়েছে। এদের মধ্যে স্বনামধন্য ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব, দ্য বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব, ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ৭.৩০, বিকেল ৩.৩০ থেকে ৫টা রোয়িং প্র্যাকটিস হয় লেকের মধ্যে। সারাবছর ধরেই বেশ কিছু রোয়িং এবং স্যুইমিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এখানে। পাশেই রয়েছে ২৬০০০ দর্শকাসনের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, নজরুল মঞ্চ, মুক্ত মঞ্চ। বিখ্যাত লেক কালীবাড়ি সরোবর থেকে পায়েহাঁটা দূরত্বে অবস্থিত।

আগে কখনও গিয়ে না থাকলে এতদূর পড়ে নিশ্চয়ই সরোবরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তাহলে আর শুভ কাজে দেরি কেন? দৈনন্দিন একঘেয়ে রোজনামচার মাঝে খানিক অবসর যাপনের জন্য গাছের ছায়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিতে দিনের যে কোনও সময়ে বা ছুটির দিনে ঘুরে আসুন রবীন্দ্র সরোবরের শান্ত পরিবেশে।

বেতার @ কলকাতা

বেতারনাটক ও তার ইতিহাস

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-১৪

ঢং! একটু আগে সাতটার ঘণ্টা বেজেছে। তাহলে এখন সাড়ে সাত। আর আধঘণ্টা। তারপরই কেউ একজন রেডিওতে বলবেন আজকের নাটক...। তরঙ্গায়িত হবে কোনও পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'ভয়! কীসের ভয়! মানুষ কত ভয় করবে অয়দিপাউস! কত! আমাদের জীবন তো কেবল কতগুলো আকস্মিকের খেলা!...' শুক্রবার মানেই বেতার নাটকের জন্য অপেক্ষা করে থাকা। নতুন নাটকের উপস্থাপনায় কখনও মন খুশিতে ভরে গেছে, কখনও আবার পুরনো নাটকের পুনঃপ্রচারে আনন্দ পেয়েছি। আজও সেই অপেক্ষাটা আছে। ভাগ্যিস তেমনভাবে রেডিও নাটক অনলাইন বা ক্যাসেটবন্দি অবস্থায় পাওয়া যায় না। গত সপ্তাহে বেতার নাটক ও তার ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। আজও ফিরে দেখব বেতার নাটকের আরও নানা প্রসঙ্গ।

আগের দিনই বলেছিলাম, বেতারের শুরু থেকেই প্রচারিত হতো নাটক এবং সেইসব নাটক সরাসরি সম্প্রচার হতো। তাই নাটকের আবহে ব্যবহৃত মিউজিকগুলিও সরাসরি বাজত। নাটকের সঙ্গে এফেক্ট মিউজিক কী যাবে সেই নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। গুলির শব্দের এফেক্টের জন্য বীরেনবাবু স্টুডিওতে বেলুন ফাটাতেন। শুকনো পাতার এফেক্টের জন্য বীরেনবাবু ব্যবহার করেছিলেন বেশকিছু খড়মড়ে কাগজ। সেই কাগজ স্টুডিওর মেঝেতে ফেলে তার ওপর হাঁটলেই প্রয়োজনীয় শব্দটি ধরা পড়ত। সেই সময় বেতারে এফেক্ট ম্যান-এর কোনও পদ ছিল না, তাই নাট্য প্রযোজককেই ভাবতে হতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ে। লাইভ এফেক্টের জন্য ভয়েস অব আমেরিকা ও বিবিসি-র কিছু ডিস্ক ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও অল ইন্ডিয়া রেডিওর তৈরি কিছু এলপি রেকর্ডও ছিল। দেখা যেত লাইভ সেইসব মিউজিক ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক সময়ই নানা ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। মাসের শেষ বৃহস্পতিবার যে ৫ মিনিটের নাটক রাত ১০.১৫ মিনিট থেকে ১১.৩০ মিনিট অবধি শোনা যেত, সেটিকে লং প্লেয়িং বলা হতো। এই নাটক বড় এলপি ডিস্কে এ রেকর্ডিং করে রাখা হতো। দোতলার পাঁচ নম্বর স্টুডিও থেকে একতলায় রেকর্ডিং হতো। রেকর্ডেড নাটক সম্প্রচার হলেও এটি অনেকটা লাইভের মতোই ছিল, কারণ সরাসরি ডিস্কে রেকর্ড হতো বলে ভুলভ্রান্তি খুব একটা এডিট করার সুযোগ ছিল না। ফলত খুব সন্তর্পণে রেকর্ডিং করতে হতো। খুব ভুলভ্রান্তি থাকলে সেই অংশটি আবার রেকর্ডিং করতে হতো।

লাইভ নাটকের আরও একটি সমস্যা হল সময়ের মধ্যে শেষ করা। রিহার্সালে ঘড়ি ধরে সবাই মন দিয়ে পাঠ বলতেন, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা গেছে, লাইভে সেইদিন হয় একটু তাড়াতাড়ি সংলাপ পড়ার জন্য, কিংবা একটু ধীরে ধীরে অভিনয় করার জন্য সময়ের হেরফের হয়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজককে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হতো। সময় বেশি লাগলে অনস্পট লাল কালিতে সংলাপ এডিট করে স্টুডিওর কাচের এপার থেকে নির্দেশ দেওয়া হতো অভিনেতাদের। আবার সময় হাতে থাকলে সংলাপ বাড়ানো হতো। উভয় কাজই বেশ কঠিন ছিল। মূলত মঞ্চ সফল নাটকের, বেতার নাট্যরূপ দিয়ে পরিবেশিত হতো বলে, সেইসব নাটক অভিনীত হতো একটু উচ্চগ্রামে। আবহসংগীত, টাইটেল মিউজিক, স্কেল চেঞ্জ মিউজিক বা নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সবটাই ছিল একটু থিয়েট্রিকাল বা অপেরাধর্মী। শিল্পীদের গমগমে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওইরকম মিউজিক খাপ খেয়ে যেত। আসলে সেই সময় (১৯৫৬-'৫৭) মনের আনন্দেই সবাই কাজ করতেন। বেতার কেন্দ্র যে খুব একটা সাম্মানিক দিত এমন নয়, তবু সঠিক সময়ে শিল্পীরা আসতেন, রিহার্সাল করতেন, একসঙ্গে আড্ডা মারতেন, সব মিলিয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল।

কান দিয়ে শোনা নয়, কান দিয়ে দেখা এটাই বেতার নাট্য প্রযোজনার মূলকথা হওয়া উচিত, এমনটাই বলতেন নাট্যপ্রযোজক শ্রীধর ভট্টাচার্য। ধীরে ধীরে মঞ্চ নাটকের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বেতার নাটক সমৃদ্ধ হতে শুরু করল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যকারের হাত ধরে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বসন্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নি মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, মনোজ মিত্র, বিমল রায় প্রমুখের উপস্থিতিতে প্রযোজিত হতে শুরু করে সফল বেতার নাটক।

বেতার নাটকের কথা লিখতে গেলে বারে বারে ঘুরে-ফিরে আসবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম। নাট্য প্রযোজক অজিত মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখছেন, 'বীরেনদা নিজেও নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করতেন। দুটি বড় নাটকের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে— সে দুটি হল ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' আর একটি শচীন সেনগুপ্তের 'প্রলয়'। ...কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে প্রতিবন্ধী অথচ এক অপরাধীর চরিত্রে বীরেনদার অভিনয় শুনে কে বলবে, এই মানুষটিই মহিষাসুরমর্দিনীর অনুষ্ঠানে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন।' সেই সময় বেতার নাটক শেখার কোনও সংস্থা ছিল না। বীরেনবাবু শিল্পীদের সামনে বসে শেখাতেন কেমন করে শ্বাস নিতে হয়, কীভাবে শ্বাস ছাড়তে হয়, দীর্ঘ সংলাপ বলতে গেলে কীভাবে চোরা দম নিতে হয়, হাঁটতে হাঁটতে কী করে অভিনয় করতে হবে, কীভাবে দম নিলে এবং ছাড়লে হাঁটার এফেক্ট আসবে, কীভাবে কণ্ঠ দিয়ে বোঝাতে হবে অসহায় মানুষের অভিব্যক্তি, ভারী জিনিস তোলার এবং নামিয়ে রাখার বহিঃপ্রকাশ, এমনকী অভিনয়ের সময় স্ক্রিপ্টের পাতা কীভাবে সরাতে হবে তা-ও দেখিয়ে দিয়েছেন এই মানুষটি। এই মানুষটি নাট্যবিভাগে আসার পর 'আবহ প্রক্ষেপক' নামক এক পদের সূচনা হয়, যার প্রথম ব্যক্তি ছিলেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। আসলে বীরেনবাবু বুঝেছিলেন রেডিও নাটক অনেকটাই নির্ভর করছে সাউন্ড এফেক্টের ওপর। যোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে প্রযোজ্য এফেক্ট ব্যবহার না করতে পারলে দৃশ্যটি যেন শ্রোতার কাছে অধরা থেকে যায়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজিত প্রায় সব নাটকের সম্পাদক ও শব্দ সংযোজনের কাজটি করতেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। নিত্যানন্দবাবুর স্মৃতি কথায় পাওয়া যায়, একদিন অফিস ফেরতা তিনি আর বীরেনবাবু হাইকোর্টের কাছে রাস্তায় ব্যাঙের ডাক ও ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে তা রেকর্ড করার জন্য আবার অফিস ফিরে এসে রেকর্ডার নিয়ে সেই অরিজিনাল শব্দ বন্দি করে বেতার নাটকে বহুবার ব্যবহার করেছেন। বীরেনবাবু নাটকে সংগীত পরিচালনার জন্য নির্বাচন করলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, তারকনাথ দে, কাজী নজরুল ইসলাম, অনাদি দস্তিদার,

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

রঞ্জিত রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখকে। পঙ্কজকুমার মল্লিক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। কাজী নজরুল পরিচালনা করেছিলেন শচীন গুপ্তের বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদৌল্লা'। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের সংগীত পরিচালনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। পরবর্তীকালে নাটকের সংগীত পরিচালনার কাজে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া গেছে।

বেতার নাটকের প্রথমদিকে অনেক ধারাবাহিক বেতার নাটকও প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বেতার নাটক হল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়'(চার পর্বে), শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'(দুই পর্বে), 'শ্রীকান্ত' (চার পর্বে), নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'ময়ূর মহল' (প্রায় একমাস), রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' (প্রায় একমাস), জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' (চার পর্বে)। এছাড়াও প্রায় একবছর ধরে ২৪টি পর্বে চলেছিল 'শশীবাবুর সংসার'।

শেষে বলি আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৪ সালে বেতারের সপ্তম জন্মদিনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একটি রঙ্গরসের নাটক লেখেন, যার বিষয়বস্তু বেতার কেন্দ্রের নানা ভুলত্রুটি। নাটকটির নাম 'ঝঞ্ঝা'। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সেই সময় বেতারে যে, যে পদে ছিলেন, এই নাটকে তাঁরা সেই সেই চরিত্রেই অভিনয় করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় কেন্দ্র অধিকর্তার চরিত্রে স্টেপলটন অভিনয় করতে অস্বীকার করেননি। ব্রিটিশ আমলে এমন একটি পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

শুধু বীরেনবাবু নন, এই বেতার নাটক থেকে উঠে এসেছেন অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী। আবার মঞ্চ, সিনেমার জনপ্রিয় শিল্পীরাও এসেছেন বেতার নাটকে। আগামী পর্বে তাঁদের কথা।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

অন্ধকারের ঘরখানি

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

ইনস্পেক্টর জেনারেল এন এস সিম্পসনের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘরখানা দেখবার মতো। ঘরে ঢুকলে মনে হবে যেন খাস বিলেতের কোনও রাজা-রাজড়ার বৈঠকখানা। মাথার ওপর থেকে নেমেছে বিশাল ঝাড়লণ্ঠন। কাঠের আসবাবের সূক্ষ্মতায় দোল খাচ্ছে রৌদ্র। ঘরে দুটো টানা-পাখা আড়াল থেকে বসে টানছে চারজন চাকর। সিম্পসন সাহেব যেমন সুদর্শন সুসজ্জিত তেমনি জাঁকজমক আর কৌলীন্য তাঁর রুচিতে। অফিসের ঘরে এতটুকু ধুলোময়লা দেখলে তিনি চাকরদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তাড়াবেন। ১৯৩০ সালে ভারতের কোণে কোণে শুধু একটা শব্দই বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে— স্বাধীনতা! ভারত যেন স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে উঠেপড়ে লেগেছে। বন্দেমাতরম, ইংরেজ ভারত ছাড়ো সারাক্ষণ শোনা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বাংলা আর পঞ্জাবের অবস্থা সবচেয়ে ভয়ানক। বাংলার কারাগারগুলিতে আর সাধারণ খুনে, ডাকাত, চোরেদের স্থান সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এত বাড় বেড়েছে। বাংলার বিপ্লবীদের কঠোর হাতে দমাতে পদ্ধতি আবিষ্কার করে ডায়েরিতে টুকে রাখেন সিম্পসন সাহেব। কলকাতা আর তার সংলগ্ন এলাকার বিপ্লবীদের কাছে একটা নাম হয়ে উঠেছেন ইনস্পেক্টর জেনারেল এন এস সিম্পসন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে এখানে দাঁড়াবে তাকে আগে সিম্পসনের ধোলাইয়ের সঙ্গে যুঝতে হবে।

সিম্পসন সাহেবের নাম হঠাৎ আবার কলকাতা থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল যেদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর পিঠে নিজের লাঠি ভাঙলেন। ব্রিটিশ সরকার সেদিন যেন টুপি খুলে রাখল সিম্পসনের পায়ের কাছে। সিম্পসনই পারেন। এরাই এখন ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ রাজের শেষ হাতিয়ার। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাই এরা যা চায় সেটাই পেয়ে যায়। প্রাসাদোপম বাসস্থান। আধুনিক টয়োটো গাড়ি, একগাদা ভৃত্য নফর। রাজকীয় জীবনযাপন সবই এদের কাছে ইংরেজ সরকারের পাশে দাঁড়ানোর ফলস্বরূপ পাওয়া মুকুটভূষণ।

সকালে অফিসে এসে প্রথমে একটা চুরুট ধরালেন সিম্পসন সাহেব। আজ তাঁর কাছে তিনটি ছেলে দেখা করতে আসবে। সরকারি বিষয়ে একটা মিটিং রয়েছে ওদের সঙ্গে। সরকারকে ওরা কিছু গোপন খবর জানাতে চায় সিম্পসন সাহেব মুচকি মুচকি হেসে হেসে চুরুটে টান দিলেন। ভাবলেন এবার তাঁর কোনও একটি বেয়ারা ডেকে বলবেন তাঁর পাটা একটু টিপে দিতে।

ঠিক সেইসময় তাঁর ঘরের দরজায় কেউ শব্দ করল। প্রহরী এসে জানাল যাঁদের সঙ্গে তাঁর আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তাঁরা এসে গিয়েছেন।

সিম্পসন প্রহরীকে বললেন ‘টেল দেম টু কাম ইন।’

তিনটি বছর কুড়ির ছেলে তাঁর ঘরে ঢুকল। খাঁটি ইউরোপীয় কায়দায় শৌখিনভাবে কোট, প্যান্ট, টাই পরে আছে তারা। সিম্পসন সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঁখুত বিলিতি ভদ্রতায় ছেলেগুলিতে বললেন ‘হ্যালো, নাইস টু মিট ইউ। ইট ইজ এন এস সিম্পসন। ইনস্পেক্টর জেনারেল অব... ’ সিম্পসনের বামহস্তে চুরুট, দক্ষিণ হস্ত করমর্দনের জন্যে ছেলেগুলির দিকে প্রসারিত।

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলি ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। শোনা গেল পরপর দুটি গুলির শব্দ। সিম্পসন সাহেবের চুরুটটি খসে পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। রক্তে ভিজে গেল ইংরেজরা পুরোপুরি বুঝে গিয়েছে যে ভারত থেকে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে তখন তারা অন্যান্য অনেক জায়গার মতো কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ও তাঁদের জিনিসপত্র সরানোর কাজ শুরু করে দিলেন।

সিম্পসন সাহেবের ঘরটার সেই চাকচিক্য আর নেই। সেই ঘর থেকে খুলে নেওয়া হল ঝাড়বাতি। তুলে নিয়ে যাওয়া হল আসবাব। আর কোনও এক গোপনতম মোড়কের ভিতর দিয়ে কেউ নিয়ে চলে গেল সিম্পসন সাহেবের দু'খানা মোটা মোটা ডায়েরি। যে সব ডায়েরিতে লেখা ছিল রাজবন্দিদের পেটানোর নির্মম কত তরতরিকা। যে-ডায়েরিতে রাজবন্দিদের গোপন জবানবন্দি অনেকসময় ব্যক্তিগতভাবেও টুকে রাখতেন ইনস্পেক্টর জেনারেল এন এস সিম্পসন।

বিনয়-বাদল-দিনেশের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সিম্পসন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, তিনি মাটিতে পড়ে যাবার আগে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। কনফিডেনশিয়াল। কোন কনফিডেনশিয়াল বা গোপন কথার বিষয়ে বলেছিলেন তিনি?

তা কেউ জানবে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে সেই কনফিডেনশিয়াল কথা ক্ষুধিত পাষাণ হয়ে রয়ে যাবে বছরের পর বছর।

সেজন্যে বাঘা বাঘা ইংরেজ অফিসারদের নিয়োগ করেছে ব্রিটিশ সরকার। সিম্পসন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জেলের মধ্যে ভয়ানকভাবে বন্দি পেটানোর কাজে শৌখিন অভিজাত স্বভাবের সিম্পসন সাহেবের কোনও জুড়ি নেই। তবে সিম্পসন সাহেবকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তাঁর কাজ শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকারী বন্দিদের গুছিয়ে পেটানো। জিইয়ে রেখে একটু করে পেটান সিম্পসন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কোনও কোনও রাতে তিনি থেকে যান শুধু রাজবন্দি পেটাবেন বলে। এমনিতে সিনেমার নায়কের মতো সুদর্শন সিম্পসন সাহেব। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে সবসময় লেগে থাকে একপ্রকার নিপাট আর নির্ভেজাল হিংস্রতা। তাঁর হাসিটি অসম্ভব ক্রূর। রাজবন্দিদের ওপর অত্যাচারের নিত্যনতুন বিপ্লবীদের সম্পর্কে। অনেক সময় এসব খবরে কোনও সত্যতাই থাকে না। রাবিশ ফেক খবর নিয়ে কিছু লোক আসে টাকা হাতানোর মতলবে। কিন্তু খবর সত্যি কি মিথ্যে পরের কথা। আগে তো সিম্পসন সাহেবকে সব শুনতে হবে মন দিয়ে। যে যা বলতে চায় সব মনোযোগ দিয়ে শোনা রাষ্ট্রনীতির অন্যতম ধর্ম। তোমাকে সমস্ত কথা শুনতে হবে। তারপরে কতটা কথা তুমি গ্রহণ করবে, কতটা ফেলে দেবে সেটা নিজের বিবেচনা দিয়ে ঠিক করতে হয়।

সিম্পসন সাহেব চুরুট মুখে দিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন। তাঁর পায়ে আজকাল বেশ ব্যথা হচ্ছে কিছুদিন ধরে। আসলে আলিপুর জেলে বন্দিদের এত লাথি মারতে হয় তাতে আর পায়ে ব্যথা হলে পায়ের দোষ কী... টেবিল, চেয়ার, ঘরের মেঝে।

ছেলেগুলি সাহেবের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল পুরো রাইটার্স বিল্ডিংটা ঘিরে ফেলেছে ব্রিটিশের পুলিশ।

ওদের মধ্যে একজন সায়ানায়েড খেল। বাকি দুজনের একজন মারা গেল পুলিশের গুলিতে অন্যজনের ফাঁসির আদেশ দিল ব্রিটিশ সরকার।

সিম্পসন সাহেবের ঘরটা অনেকদিন কেউ আর ব্যবহার করতে পারল না।

ঘরের ভিতর যেন এক হাড়হিম নৈঃশব্দ্য অনেকে অনুভব করে। সিম্পসনের সাধের আসবাবে ধুলো জমে। তাঁর বিলিতি কাচের পুতুলগুলোর ওপর বিবর্ণতার একটা আস্তরণ পড়তে থাকে।

দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত আগে যখন কীভাবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে স্যুট টাই পরে পিস্তল নিয়ে, সায়ানাইড নিয়ে রাইটার্সে ঢুকে পড়েছিলেন শহিদ বিনয়-বাদল-দীনেশ, কারা তাদের গোপনে সাহায্য করেছিল? কানাঘুষো শোনা যায় সিম্পসনের বাড়বাড়ন্তে ভয়ানক হিংসে করে অন্য এক সমগোত্রীয় ইংরেজ অফিসার নাকি বিনয়-বাদল-দীনেশকে সাহায্য করেছিলেন অতি গোপনে। ইতিহাসের পাতায় সেই পলাতক সাহায্যকারীর নাম লেখা নেই। সব কনফিডেনশিয়াল ঘটনাই রাইটার্সের অলিন্দে মিলিয়ে গিয়েছে নিশ্চুপে। এখন রাইটার্সে ঢুকে আর কেউই কোনওদিন খুঁজে পাবেন না সিম্পসন সাহেবের রাজকীয় ঘরখানা। সেই কনফিডেনশিয়াল ঘরটিকে আলোর মধ্যে দেখা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
কলকাতা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

তাস, দাবা, ক্যারাম ছেড়ে কলকাতা এখন মজেছে অনলাইন গেমে

ইমন মুখোপাধ্যায়

তখন আমরা কলেজের গণ্ডি পেরোইনি। স্কুলেই একটু উঁচু ক্লাসে উঠেছি সবে। ক্রিকেট, ফুটবল ছেড়ে সবে একটু-আধটু করে বড়দের খেলায় হাত পাকাতে শিখেছি। বিকেলবেলা মাঠ নয়, টানত পাড়ার ক্লাবঘর। বিকেলবেলা নিত্যদিনের আড্ডার সঙ্গী ছিল তাস এবং ক্যারাম। একটু মেধাবী বা এলিটদের অবশ্য দাবা। সমবয়সি বান্ধবীদের কাছে শুনতাম তাদের আড্ডা পরনিন্দা-পরচর্চারও সঙ্গী ছিল এই খেলাগুলি। কলেজের সময়েও এই অভ্যাস বজায় ছিল। একটু ছোটরা খেলত লুডো। ছেলেবেলায় বাবা-কাকাদেরও দেখেছি এই তাস ও দাবার নেশা ভীষণভাবে টানত। মা বা কাকিমাদের সঙ্গে কতবার এই নিয়ে ঝগড়া দেখেছি, তার ইয়াত্তা নেই। উত্তর কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এরকম ক্লাবের রীতিমতো ঠেক ছিল। কিছুদিন আগে অবধি বাগবাজার থেকে গিরীশ পার্ক অবধি কেউই এর ব্যাতিক্রম ছিল না। যা বিদ্যমান ছিল তিলোত্তমার দক্ষিণেও। কালের নিয়মে এখন বড় হয়েছি। আর কয়েকদিন পর বুড়ো হব। পাড়ার হাফপ্যান্ট পড়া ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে তারা ওই ক্লাবঘরের ওপরে সেই টানটি আর অনুভব করে না। তারা এখন ব্যস্ত থাকে মোবাইলে। একটু অবসর পেয়েছে কি তাদের মোবাইলে চলতে শুরু করে, ক্যান্ডি ক্রাশ সাগা, পুল বয়, টেম্পল রান সহ একের পর এক গেম। কোনও কোনওটি অফলাইন, আবার বেশিরভাগই অনলাইনে। সেখানে থাকে বিভিন্ন অনলাইন কম্পিটিটরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। আর টাকা জেতার সুযোগও। আর সেইসবের লোভেই এই চক্রের ফাঁদে পা দিচ্ছে আজকের যুবসমাজ।

এক গবেষণা জানাচ্ছে, এই নেশা জুয়ার নেশার মতোই ভয়ংকর। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এই গবেষণা মোবাইল গেমিং নিয়ে বিশ্বে প্রথম। বর্তমান প্রজন্ম যেভাবে মোবাইল গেমিংয়ে ক্রমশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তাতে এই সমস্যাকে 'ইন্টারনেট গেমিং ডিজঅর্ডার' বলে চিহ্নিত করেছে আমেরিকান সাইকিক অ্যাসোসিয়েশন। তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে ইন্টারনেট গেমিং ডিজঅর্ডারের নয়টি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়। চেকলিস্ট দেখে চারটি দেশের পুরুষ ও মহিলাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন ইউনিভার্সিটির অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের গবেষকরা। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জার্মানির মোট ১৯,০০০ পুরুষ ও মহিলাকে কয়েকটি সমস্যার বিষয়ে হ্যাঁ বা না উত্তর দিতে বলা হয়। এঁদের মধ্যে অর্ধেক অংশগ্রহণকারী জানান তাঁরা সম্প্রতি ইন্টারনেট গেম খেলেছেন। আর তাঁদের মধ্যে তিন শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানান তাঁরা প্রশ্নপত্রে থাকা লক্ষণগুলোর পাঁচটি বা তার বেশি নিজেদের মধ্যে লক্ষ করেছেন। এক শতাংশ জানিয়েছেন তাঁরা গেম খেলা ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারেন না ও নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন। এই গবেষণার সব অংশগ্রহণকারী ইউগভ ও গুগল সার্ভের হেলথ চেকলিস্টে অংশগ্রহণ করেন। আমেরিকান সাইকিক অ্যাসোসিয়েশনের উল্লেখ করা নয়টি লক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ছিল— নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা, অন্য কাজের প্রতি উৎসাহ কমে আসা, সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, গেম খেলতে গিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সুযোগ হারানো। এই সমীক্ষার মুখ্য গবেষক অ্যান্ড্রু প্রিজবিলসকি বলেন, ইন্টারনেট গেমিং ডিজঅর্ডার নিয়ে এই প্রথম কোনও গবেষণা হল। এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতজন অবসরযাপনের অন্যতম উপায় হিসাবে ইন্টারনেট গেমিং বেছে নিচ্ছেন অনেকেই তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে এইসব লক্ষণ দেখা গেছে। আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রিতে এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু কচিকাঁচা বা টিনএজাররা নয়, বর্তমান সময়েও এই গেমে সমান আসক্ত কিন্তু বড়রাও। চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে ট্রেন্ডটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে ছোপাষা গৃহবধু এইসব গেমের অনুরক্ত অনেকেই। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং এক সন্তানের মা দেবারতি জানালেন, 'খেলাধুলো আবার একা একা জমে নাকি! একসঙ্গে জমিয়ে না খেললে আর মজা কোথায়?' এই ব্যাপারটাকেই কিন্তু ক্যাশ করেছে গেম ডেভেলপাররা। ফেসবুকের মতো এসএনএসের দৌলতে তাই সোশ্যাল গেমসের চাহিদা আকাশছোঁয়া। দেখুন না প্রতি মাসে 'শেফ ভিল' খেলা লোকের সংখ্যাই প্রায় পাঁচ কোটি। দেবারতির ক্লান্তি তাড়ানোর দাওয়াই যেমন 'ভ্যাম্পায়ার গেমস', অফিসের ক্লান্তি এক মুহূর্তে উধাও। মুচকি হেসে যোগ করলেন, রব প্যাটকেও ভাবা যায় খেলতে খেলতে। ফ্যান্টাসি ফুটবল লিগটাও হেব্বি লাগে। বেশ টিম ম্যানেজার-টিম ম্যানেজার মনে হয় নিজেকে, জিততে থাকলে তো মনে হয় আমিই রাজা, বলছিলেন অনিমেষ। সম্পর্কে তিনি দেবারতির স্বামী সোশ্যাল গেমসের এই এক দিক। বন্ধুদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া যায়। স্কোরটা সবাই দেখতে পারে যে! তবে নিজের স্কোর কম থাকলে… বেশ চাপ বস্।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এখন যেন শিশু-কিশোরদের ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী হয়েছে এই গেমগুলি। মোবাইল ফোন তো আছেই। সঙ্গে যোগ হয়েছে নিনটেন্ডো থ্রিডিএস, প্লে-স্টেশন পোর্টেবল বা প্লে-স্টেশন ভিটার মতো হাতে ধরা ডিভাইস। সুবিধা একটাই, যেখানে চাইবেন খেলতে পারবেন।

'আগের বছর বাবাকে ঝুলোঝুলি করে একটা নিনটেন্ডো কিনেছিলাম। তারপর থেকে গেম এতেই খেলি', বেশ গর্ব ঝরে পড়ে কলকাতার একটি নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অনিন্দ্যর গলায়। 'তবে হ্যাঁ, খাওয়ার টেবিলে মায়ের কাছে এ নিয়ে বেশ বকা খাই।' অনিন্দ্যর মতো গেম-পাগলদের জন্যই এখন অনেক গেম তৈরি হচ্ছে শুধু মোবাইলের জন্য। এতক্ষণে হয়তো ভাবছেন, এইসব মোবাইল গেম-টেম খেলা সময়ের অপচয়। তবে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউয়ে চোখ বোলাতে পারেন। সেখানকার একটি লেখায় দেখা যাচ্ছে, মিনিট পাঁচ অ্যাংরি বার্ডস বা এধরনের গেম নিয়ে মেতে থাকা সময়ের অপচয় তো নয়ই, বরং এটা আপনার শারীরিক আর মানসিক সক্রিয়তা বাড়াবে।

তবে এতকিছুর পরেও এ-কথা স্বীকার করে নিতে এতটুকু দ্বিধা নেই, এই অনলাইন গেমগুলির ট্রেন্ড ভয়াবহভাবে বাড়ার জন্য অনেকদিকে ক্ষতিই হচ্ছে। অনলাইন গেম আসক্তি এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে পৃথিবীতে। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, নানা বয়সি শিশু কিশোর ও তরুণদের আকৃষ্ট করে বানানো এসব অনলাইন গেম। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা অনলাইন গেমের আসক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে নানা ধরনের সতর্কবাণী দিচ্ছে। তাঁদের মতে, শিশু কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও তরুণদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করছে এসব গেম। প্রায় সময় এর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও আত্মহত্যা ঘটানোর খবরের শিরোনাম হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। বিভিন্ন দেশে 'ব্লু হোয়েল সুইসাইড গেম' নামের একটি সোশ্যাল গেমিং-এর নেশায় পড়ে আত্মহত্যা ও নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছে এই গেমপ্রেমীরা। এই গেমে প্রতিযোগীদের মোট ৫০টি আত্মনির্যাতনমূলক ধাপ শেষ করতে হয়। নিজেকে ক্ষত করার মধ্য দিয়ে এই গেমসের ধাপগুলো এগিয়ে যায়। শুরুর দিকে আকর্ষণীয় ও তাক লাগানো হলেও শেষের দিকে এই আত্মনির্যাতন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। যার কারণে শুরুর দিকে নেশায় পড়ে গিয়ে শেষের দিকে এসে আর নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই গেমসের ধাপগুলোত অংশগ্রহণ করতে প্রতি ধাপের আত্মনির্যাতনের ছবি গেমিং পেজে পোস্ট করতে হয়। প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ ৫০তম ধাপের শর্তই হল আত্মহনন। যার সাম্প্রতিকতম শিকার মুম্বইয়ের এক কিশোর। মনপ্রীত সিং। বছর চোদ্দোর ক্লাস নাইনের ওই ছাত্র এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। মনপ্রীতের বন্ধু-বান্ধবদের প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে, 'ব্লু হোয়েল' নামে এক অনলাইন গেম নিয়ে চর্চা করত ওই কিশোর। এই গেমের চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে মনপ্রীত। মনপ্রীতই এ-দেশে এই খেলার প্রথম শিকার বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু 'ব্লু হোয়েল'ই নয়, অনলাইন দুনিয়ায় এরকম 'সুইসাইড গেম' আরও রয়েছে। আশার কথা, এসব মারণ গেমের কবল থেকে এখনও সুরক্ষিত আমাদের কলকাতা। কিন্তু কতদিন? আর কতদিন? সময়ই জানে।

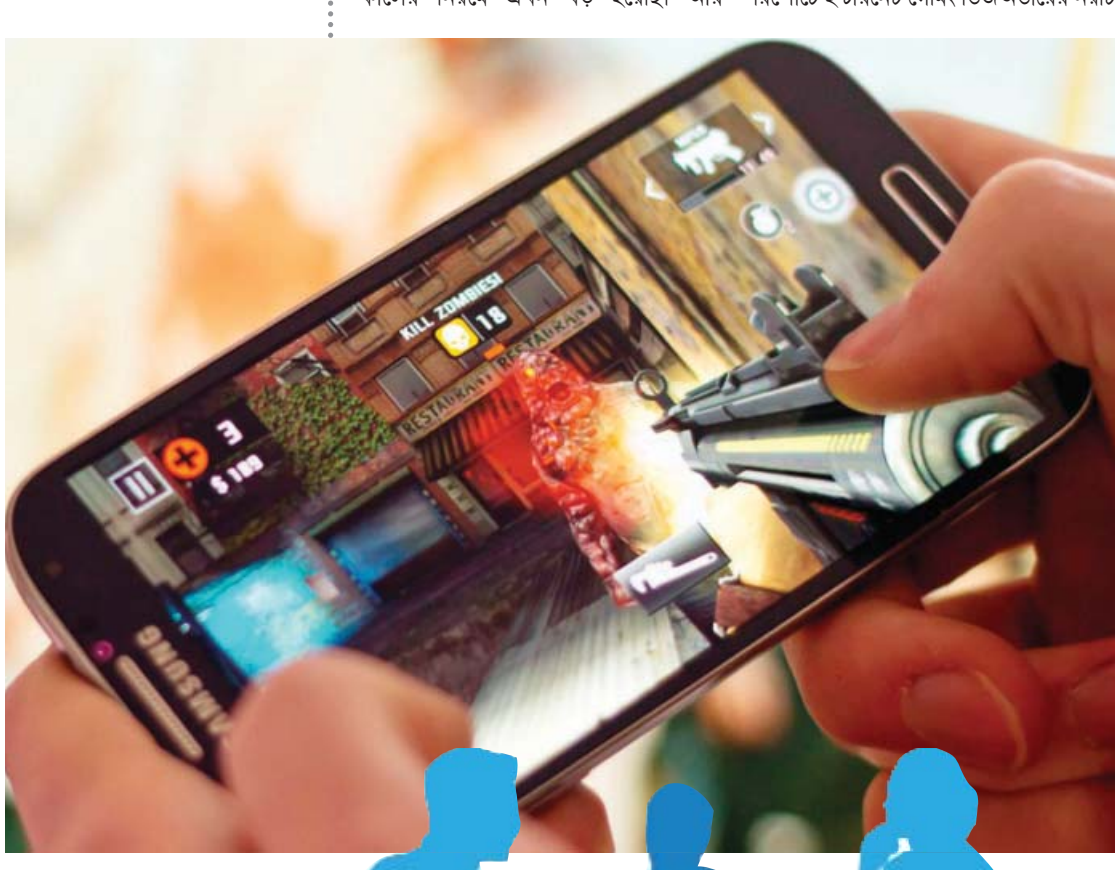

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

ঐতিহ্যে, গরিমায় আর প্রতিমায় আজও স্বতন্ত্র রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজো

বিপাশা চক্রবর্তী

কলকাতার সেরা বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম স্থানে রয়েছে রানি রাসমণির বাড়ির পুজো। জানবাজারের এই বাড়ির রীতি, প্রতিমা, ভোগ সব কিছুর দিক থেকেই এই পুজো স্বতন্ত্র। এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম। জানবাজারে রানি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম দাস দুর্গাপুজো শুরু করেন। প্রীতিরাম দাসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে অর্থাৎ রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র এই পুজোর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর রানি রাসমণি পুজোর সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৮৩৭ সাল থেকে এই পুজোর সমস্ত কিছু সামলান রানি রাসমণি। এই বাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমংসহদেবকে সখীবেশে দুর্গাপুজো করা হয়। তবে কালীপুজোর শুরুর অনেক আগে থেকেই এই বাড়িতে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। রানির কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় এই বাড়িতে জামাইরাই ছেলের দায়িত্ব পালন করতেন। এই বাড়ির পুজোয় তিনদিন ধরে চলে কুমারী পুজো। প্রীতরাম দাস নির্মিত পাঁচ খিলানের দু'দালান বিশিষ্ট ঠাকুরদালানে প্রাচীনত্বের ছাপ সেই যুগকে মনে করিয়ে দেয়। আজও দেখা যায় বেশ কিছু অলংকরণ। বনেদি বাড়ির সেই যুগের জৌলুস না থাকলেও এখনও সেই রীতি মেনে ও নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজো চলে। মানুষ ভক্তিভরে পুজো-অর্চনা করার পাশাপাশি প্রতিমা দর্শন করেন।

এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমার কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গা প্রতিমা কুমোররা তৈরি করেন না। বীরভূমের চিত্রকররা এই প্রতিমা তৈরি করেন। তাই এই মূর্তি ছাঁচে তৈরি হয় না, তৈরি হয় হাতে। সেইসঙ্গে চালচিত্রে থাকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের বস্ত্রহরণ, গোপিনীদের সঙ্গে জলকেলি— এরকম নানান পৌরাণিক কাহিনি। প্রায় ২২৬ বছর ধরে বীরভূমের চিত্রকররা এই কাজ করে আসছেন। প্রতিমার মুখের রং শিউলি ফুলের বোঁটার মতো— অর্থাৎ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা। সেইসঙ্গে হাতেগোলা রং দিয়ে প্রতিমায় রং করা হয়। প্রতিমার শোলার সাজ আসে বর্ধমান থেকে। প্রতিমার মুখ হাতে গড়া। পুরনো রীতি মেনে ঠাকুরদালানে বাড়ির মহিলারা প্রতিমার বাঁদিকে এবং পুরুষরা ডান দিকে দাঁড়ান। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই পরিবারের প্রতিমা। অন্যান্য বনেদি পরিবারের প্রতিমার চেয়ে এই বাড়ির প্রতিমা আকারে অনেকটাই বড়। প্রতিমার মুখ হাতে গড়া। তাতে গ্রামবাংলার প্রাচীন শিল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এখানে

সিংহ স্বাভাবিক আকৃতির হয়। অন্যান্য প্রাচীন পরিবারের দুর্গা প্রতিমার সিংহের মতো ঘোটকাকৃতি নয়। এখানে দেবীর চালচিত্রেও থাকে বৈচিত্র। আঁকা হয় চণ্ডী ও পুরাণের নানা কাহিনি। এছাড়াও থাকে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার উল্লেখযোগ্য দৃশ্য।

এই বাড়ির রীতি অনুযায়ী, শুক্লা প্রতিপদ থেকে মা দুর্গার পুজো শুরু হয়। ওই দিনই হয় মায়ের বোধন। ১০ দিন ধরে পুজো চলে জানবাজারের এই বাড়িতে। একটা সময় পুজোতে চল্লিশ মণ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হত। এখন তা কমে এক-দেড় মণ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব হল, তাঁদের বাড়ির পুজোতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী— তিনদিনই কুমারী পুজো হয়। আগে জানবাজারে বলি প্রথার প্রচলন ছিল। সেই পশু হিসাবে ছাগ বলি দেওয়া হতো। পরে এখানে পশুবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখন চালকুমড়ো, আখ বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। একটা সময় সন্ধিপুজোয় এতটাই ভিড় হতো যে কোনও রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো।

এই বাড়ির ভোগের বৈশিষ্ট্য বলতে মাকে এখানে অন্নভোগ দেওয়ার রীতি নেই। লুচি, মিষ্টির ভোগ দেওয়া হয়, সঙ্গে থাকে নানারকম ভাজা। মিষ্টির মধ্যে থাকে বোঁদে, দরবেশ, পান্তুয়া, নারকেল নাড়ু প্রভৃতি।

পুজোর সময় এই বাড়িতে আমিষ রান্না হয় না। বাড়ির সব সদস্যই প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ খান। রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গেও জড়িয়ে আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম।

এ-বাড়ির দুর্গাপুজোয় বেশ কয়েকবার এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানেই এক বার সন্ধ্যারতির সময় 'সখীবেশ'-এ তিনি দুর্গাপ্রতিমাকে চামর দিয়ে বাতাস করছিলেন। সেই নিয়ে শোনা যায় এক কাহিনি। পুজোর দালানে মথুরবাবু অর্থাৎ রানি রাসমণিদেবীর জামাই দেখেছিলেন তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দেবীর পাশে এক জন স্ত্রীলোক প্রতিমাকে চামর দিয়ে বাতাস করছেন। তিনি চিনতে না পারলেও ভেবেছিলেন হয়তো নিমন্ত্রিত কোনও অতিথির স্ত্রী। পরে যখন তাঁর স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে জগদম্বা দেবী তাঁর স্বামীকে জানিয়েছিলেন, তাঁর পাশে চামর হাতে ভাবাবস্থায় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

তবে সেদিনের কথা আজ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রানির আন্তরিকতা ও পরমহংসদেবের পদধূলি। তাই এই বাড়ির মাহাত্ম্য অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে এখানে আজও পুজো চলে আসছে। শুধু পরিবারের লোকেরাই নন, অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ এখানে প্রতিমা দর্শন করতে আসেন।

৪ সেপ্টেম্বর
মিত্র বাড়ির পুজো
১১ সেপ্টেম্বর
দাঁ বাড়ির পুজো
১৮ সেপ্টেম্বর
দর্পনারায়ণ মল্লিক বাড়ির পুজো
২৫ সেপ্টেম্বর
শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

সংগীতচর্চায় কলের গান পেরিয়ে ইউটিউব ক্রেজ

বুদ্ধদেব হালদার

ইওসিন যুগের অন্ধকার থেকে উঠে এসে যে পাখি প্লিস্টোসিনের রঙিন আলোয় পালক ভিজিয়ে আজও ভেসে চলেছে অনন্তকাল প্রবাহের দিকে, তার বাঁক বদলের ইতিহাসের দিকে তাকালে খুঁজে পাওয়া যাবে বহু বিদ্যুতের জন্মকথা। এই অসীম কালের পাতায় ক্ষণিকের জন্য যে আঁচড় রক্ত ঝরাতে সক্ষম হয়েছে, তাকে অনুসরণ করেই এগিয়ে চলে সময়। আর সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতি।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে কলকাতা। এগিয়েছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তি আমাদের আরও সস্তা ও অ্যাভেলেবল হতে শিখিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তো অতীতের ঐতিহ্যকে কখনওই অস্বীকার করা যায় না। বরং অতীতের দিকে তাকিয়েই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে আমাদের বর্তমান অবস্থানটা ঠিক কোন জায়গায়। বাঙালি চিরকালই গানপাগল। এমন প্রচুর গান আছে, যেগুলির আমরা খুব সহজেই ডাউনলোড করে শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারি আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমাদের। তাঁরা হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন। মনে মনে ভাববেন, তাঁরা তাঁদের ছোট্টবেলায় তো এ গান ধুতরো ফুলের মতোন দেখতে পিতলের চোঙওয়ালা বাক্সটির কাছে পরিবার সুদ্ধ সকলে মিলে একসঙ্গে বসে শুনতেন একসময়। এ গান আমরা কোথায় থেকে খুঁজে পেলাম! হ্যাঁ, তাঁরা আশ্চর্য হতেই পারেন। কারণ, এ গান তো বাঙালির 'কলের গান'। নতুন প্রযুক্তির কাছে হেরে যাওয়া সেই কলের গান বা গ্রামোফোন বাঙালির জীবন থেকে সত্তর বা আশির দশকেই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির পুরনো ঐতিহ্যের প্রাণময় ধারাটিকে সে চক্ষুদান করে দিয়ে গেছে, এ-কথা বললে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না। একসময় সংগীতপ্রেমী প্রতিটি সামর্থ্যবান পরিবারেই শোভা পেত কলের গান বা গ্রামোফোন। কারণ এখনকার মতো মোবাইল ফোন বা এমপিথ্রি-তে গান শোনা তো অনেক দূরের কথা, ক্যাসেট প্লেয়ার বা সিডি প্লেয়ারেরও তখন চল হয়নি। সে সময় গান শোনার মাধ্যম ছিল কলের গান বা গ্রামোফোন। ১৮৭৭ সালে টমাস আলভা এডিসন প্রথম শব্দ রেকর্ড করে আবার তা থেকে শব্দ শোনার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এডিসন তাঁর যন্ত্রের নাম দেন ফোনোগ্রাফ। এরপর ১৮৮৭ সালে এমিল বার্লিনার ফোনোগ্রাফের আরেকটু উন্নত সংস্করণ আবিষ্কার করেন এবং এই যন্ত্রের নাম দেন 'গ্রামোফোন'। এই গ্রামোফোন যন্ত্রটি চালানোর জন্য কোনও বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো না। ফলে এই যন্ত্রটি দ্রুত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম গ্রামোফোন নিয়ে আসেন এফ ডব্লু গেইসবার্গ। ১৯০২ সালে কলকাতার বাঙালি শিল্পী গওহরজানকে দিয়ে প্রথম বাংলা গানের রেকর্ড করেন। গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরিতে প্রথম ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হলেন হেমেন্দ্রমোহন বসু। কলকাতার বেলিয়াঘাটায় প্রথম রেকর্ড কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালের ১৯ জুন। প্রথম দিককার গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলোতে এক পিঠে একটি করে গান থাকত। পরে লং প্লে রেকর্ড তৈরি হতে শুরু হয়। তখন এক পিঠে দুটি, কখনও-বা খুব বেশি তিনটি করে গান থাকত, যা গ্রামোফোন ব্যবহারের শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গত শতকের বিশের দশক থেকে শুরু করে প্রায় আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত বাঙালির কলের গানের অস্তিত্ব ছিল। সেসময়ের বাঙালি জীবনের সঙ্গে খুব গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল এই গ্রামোফোন সংস্কৃতি। বিনোদনের এরকম উপকরণ বাঙালির কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নিতে সফল হয়েছিল। শুধু যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর চল ছিল তা নয়। মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষও এর স্বাদ থেকে কোনওরকম ভাবেই বঞ্চিত হননি। কারণ, সে সময় গ্রামে-গঞ্জে পয়সা বা ফসলের বিনিময়ে গ্রামোফোনের গান শোনানোর জন্যে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাদারেরও আবির্ভাব ঘটত। মেলা বা আড়ং ছিল কলের গান শুনিয়ে কড়ি আদায়ের আর এক শাঁসালো জায়গা। অনেক সময় গ্রামোফোন কোম্পানির উদ্যোগেও নানা জায়গায় কলের গানের প্রচার-সফরের ব্যবস্থা থাকত। বিদেশিদের সৌজন্যে গ্রামোফোনের চল শুরু হলেও বাঙালিরাও পিছিয়ে থাকেননি। এর পেছনে যে শুধু ব্যবসার লোভনীয় হাতছানিই ছিল তা নয়, এক ধরনের স্বদেশি চেতনাও যুক্ত হয়েছিল। অল্পদিনেই বাঙালির হাতে এ ব্যবসার প্রসার ঘটে। তারা সাহেব-কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। একের পর এক গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির বাঙালি কোম্পানি গড়ে ওঠে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, বেকা রেকর্ড, নিকোল রেকর্ড, ওডিয়ন রেকর্ড, প্যাথি রেকর্ড, কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানির পাশাপাশি পরপর বাঙালিদের রেকর্ড তৈরির প্রতিষ্ঠান এইচ বোসেজ রেকর্ড, ডোয়ার্কিন রেকর্ড, রয়্যাল রেকর্ড, বীণাপাণি রেকর্ড, কমলা রেকর্ড, শাহানশাহ্ রেকর্ড, মেগাফোন রেকর্ড, হিন্দুস্তান রেকর্ড, সেনোলা রেকর্ড, পাইওনিয়ার রেকর্ড এসব কোম্পানি দেশভাগের আগেই গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা গানের ভুবন হয়ে ওঠে তরঙ্গমুখর।

১৯১০ সালে গড়ে ওঠা মেগাফোন কোম্পানির কথা হয়তো এই সময়ের কেউ কেউ অবশ্যই মনে রেখেছেন। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিকল্পক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। সিতাংশুশেখর ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, করুণাময় গোস্বামী, দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই কোম্পানির পরিচিত গায়ক। বলাই বাহুল্য এই বিখ্যাত বাঙালিদের কণ্ঠস্বর মেগাফোন কোম্পানিকে পরিচিতির আলোয় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি ছিল সে সময়ের অপর একটি বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানি। চণ্ডিচরণ সাহা এই কোম্পানি শুরু করেছিলেন মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও কবিতা প্রচারের উদ্দেশ্যে। শোনা যায় কোনও এক সময় রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন। এই কোম্পানির তারকাশিল্পীরা ছিলেন কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন, সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। কমলা ঝরিয়ার গাওয়া 'চিন্তামযী তারা তুমি' বা 'মা আমায় ঘুরাবি কত' কিংবা প্রণব রায়ের 'আমি বনফুল গো', 'এমনি বর্ষা ছিল সেদিন' গানগুলির কথা আজও আমরা গলা ছেড়ে গেয়ে উঠি। কলের গান নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট লিখেছেন, 'তখনকার দিনে আমাদের ছোটবেলায় ছিল সেই আটাত্তর আরপিএম-এর রেকর্ড। দু'দিকে একটা করে গান। সারা বছর প্রতীক্ষা করে থাকা নামী শিল্পীদের মাত্র ওই কয়েকটা গানের জন্য চাতকপাখির মতো। যদিও একই গান দু'পিঠে ভাগ করে দেবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল বড়ো গানের ক্ষেত্রে। আমার জানা জগন্ময় মিত্রের গাওয়া 'সাতটি বছর আগে', 'সাতটি বছর পরে' একই গান দুপিঠে, পরে বাড়িতে গ্রামোফোনে শুনেছি। পরে সলিল চৌধুরীর 'রানার', 'গাঁয়ের বধূ' প্রভৃতি আরও গান একইভাবে ব্যবহার হয়েছে। কারণ তখন সেই রেকর্ডের এক পিঠের সময়সীমা ছিল অনূর্ধ্ব ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড।'

পুরনো দিনের সেই 'সুখী গৃহকোণ/শোভে গ্রামোফোন' প্রবাদটি আজকের দিনে আর খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় পাঁচটি দশক ধরে বাঙালির সংগীতচর্চাকে যে মাধ্যমে ভারতের সকল মানুষের কাছে পরিবেশন করা হতো তাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আজকের গ্ল্যামারাস ইউটিউবেরও নেই। গত শতাব্দীর আশির দশকেই গ্রামোফোনের ব্যবহার বাঙালি জীবন থেকে ক্রমে মুছে যেতে শুরু করে। এরপর ওই ট্র্যাডিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাসেট প্লেয়ার খুব বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও গান শোনার মাধ্যম হিসাবে ক্যাসেটের কোনও বিকল্প ছিল না। কলকাতায় আশির দশকের শেষের দিকে কিংবা বলা ভালো নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। বার্লিন রেডিওর এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৬৩ সালের ৩০ আগস্ট প্রথম এই মাধ্যম বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়া হয়। আর এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকহারে বিশ্বের দরবারে একে সর্বজনীন করে তোলে। এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক ইলেকট্রনিক্স পণ্য নির্মাতা ফিলিপস। সেই সময়ের পরিচিত মাধ্যমগুলির তুলনায় এটি ছিল সবথেকে সহজ প্রযুক্তিগত এক উন্নত মাধ্যম। পুজোর প্যান্ডেলে কুমার শানু বা আশা ভোঁশলের বাংলা গানের পাশাপাশি নচিকেতার 'নীলাঞ্জনা' বা অঞ্জন দত্তের 'বেলা বোস' আমরা কখনওই ভুলব না। সেসময় এসব গানের ক্যাসেট দোকানে দোকানে পাওয়া যেত। যদিও খুব কম সময় এই মাধ্যম বাংলা গানের চর্চাকে আগলে রাখতে পেরেছিল। কারণ, ২০০০ সাল থেকে বাংলা গানের সিডির ব্যবহার যেন বাংলা গানকে আরও সহজভাবে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শুরু করেছিল। প্রায় এক দশক ধরে এই মাধ্যমটি বাংলা সংগীতের চর্চাকে লালন-পালন করে আসছে।

এরপর পরের পাতায়

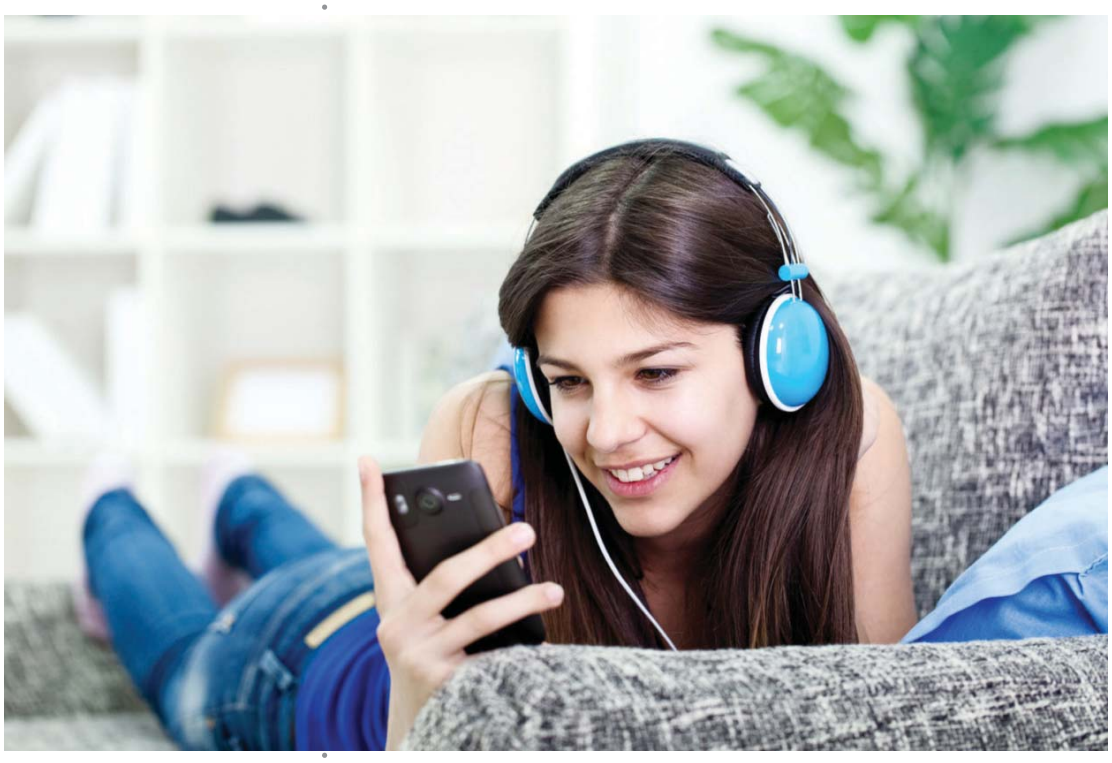

সঠিক কাল-তারিখের ইতিহাস হয়তো আমাদের জানা নেই, কিন্তু নিজের মনেই আমরা সেগুলি কোনও না কোনও সময় গুনগুনিয়ে উঠি। হয়তো সে গান কোনও এককালে আমাদের ফর্মার জেনারেশন চোঙ লাগানো রেকর্ড প্লেয়ারে শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু প্রযুক্তির আশীর্বাদে আমাদের আজকের এই ওয়াই-টু-কে-র দুনিয়ায় সেই গান ইউটিউবে খুঁজে পেতে মোটেও কোনও সমস্যায় পড়তে হয় না। তাই, গানপাগল বাঙালির সংগীতচর্চায় গ্রামোফোন থেকে ইউটিউব কালচারের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমা যেন কয়েকটি যুগের আরশিকে পর পর যুক্ত করে নিয়ে বুনে তোলা কোনও পরশপাথর।

'দিন গুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'— পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শোনার অভ্যাসটা আজও বাঙালির যাপনচিত্র থেকে হারিয়ে যায়নি। ইন্টারনেট থেকে সে গান

সেপ্টেম্বর থেকে
বিনোদন
একেবারে
অন্যরকম

রাত হলেই ভেসে আসে কান্নার শব্দ

সোমনাথ আদক

ভূত শব্দটার মধ্যে যেমন এক অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে, তেমনি আছে হাড়হিম করা গা-ছমছমে ভাবও। এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে নানা অজানা রহস্য। অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায় কত অলৌকিক গল্প। জনশ্রুতি আছে, শহরের বহু স্থানে নাকি এখনও অশরীরীরা ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সিসি টিভির ফুটেজ, আবার কোথাও ক্যামেরার ফ্রেমবন্দি অদ্ভুত কিছু দৃশ্যের জাগতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেইসব ছবি ভাইরাল হলে যেমন হয়েছে তুমুল হইচই তেমনই অদৃশ্য, অলৌকিক, কাল্পনিক অবয়বটির অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্কও কম হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে ভুতের অস্তিত্ব নিয়ে। হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ভুত নিয়ে নিরন্তর গবেষণা। আর এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নান প্যারানরমাল অ্যাকটিভিটি বারবার উস্কে দিয়েছে ভুত সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলোকে।

সময় বদলেছে, বদলেছে পরিস্থিতি। সেদিনের সাদা কালো কলকাতা আজকের স্মার্ট সিটি। তার আনাচে-কানাচে শপিং মল, হাইরাইজ আর ঝাঁ-চকচকে এলইডি আলোর চিত্রকল্পেও শুধু একইভাবে মিথের আড়ালের থেকে গেছে সেই গুচ্ছ গুচ্ছ গল্পগুলো। যা আজও ভুত বিলাসীদের কাছে ভয়ের কিংবা উপভোগ্য। আর সেইসব গল্পগুলো যেসব স্থানকে ঘিরে রয়েছে বা যে-সব স্থানে ভুত আছে বলে জনশ্রুতি, তার মধ্যে হাওড়া ব্রিজের নিম্নাংশের ঘাট বা ভারতের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে পুরনো ফুলের বাজার মল্লিক ঘাটকে অন্যতম ভৌতিক স্থান বলে মনে করা হয়।

উনিশ শতকের সেতু প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অন্যতম নিদর্শন হাওড়া ব্রিজ। ঐতিহ্যবাহী হাওড়া ব্রিজের নীচের অংশটি মল্লিক ঘাট। শোনা যায় রাত গভীর হলে হাওড়া ব্রিজের বর্ণিল আলো আর গঙ্গাবক্ষের আবছা আলো-অন্ধকারে ব্রিজের নীচের এই ঘাটের রূপ পালটাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে মোহময় আলোর গভীর থেকে উঠে আসে রহস্যের হাতছানি। অন্তঃসলিলা গঙ্গার এই ঘাট হয়ে ওঠে অশরীরীদের লীলাক্ষেত্র।

শোনা যায় মল্লিকঘাট ফুলের বাজারের নিকটবর্তী ঘাটটিতে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁরা অনেকেই নাকি সেখানে বিভিন্ন ভৌতিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। কোনও মহিলাকে সাদা শাড়ি পরে ঘুরতে দেখেছেন, কিংবা মহিলার গলায় অদ্ভুত নাকি সুরে কান্না শুনেছেন। সে কান্না যেন মানুষের কান্না নয়। সে কান্নার সুর একেবারে অন্যরকম। চলছে তো চলছে। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী গায়ের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার মতো সে শব্দ। স্থানীয়দের অনেকেই দাবি করেন প্রতিদিনই অজস্র মৃত্যু দেখে এই ঘাট। তাদের ধারণা গঙ্গায় ডুবে যারা মারা গেছে-তাদের আত্মাই ঘুরে বেড়ায় এখানে। জনশ্রুতি আছে এইসব অতৃপ্ত আত্মারা মল্লিক ঘাটের আশে পাশেই থাকে। অনেকেই বলেছেন ভোর রাতে এই ঘাটের ধারে জলের নীচ থেকে দু-হাত বাড়িয়ে কাউকে ডাকতে দেখা গেছে। এগুলো আদতে ঘটনা না রটনা, তার উত্তর মেলেনি।

শহরের যতগুলো সুইসাইড জোন আছে হাওড়া ব্রিজ তার মধ্যে অন্যতম। এই হাওড়া ব্রিজকে কেন্দ্র করে ভয়ার্ত পরিবেশ সবসময়ই ছিল। হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রচুর মানুষ আত্মহত্যাও করেছে। অনেকের মতে হাওড়া ব্রিজের নীচের এই মল্লিকঘাট মূলত ফুলের বাজার হলেও একেবারে নিরাপদ নয়। এখানে অনেকেই পা পিছলে পরে, জলে ডুবে মারা গেছে। কেউ কেউ বলেন হঠাৎ করেই দেখা যায় কেউ যেন জলে ডুবে যাচ্ছে আর ডুবে যেতে যেতে বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করে চলেছে। হাত দুটো জলের ওপর তুলে কাটা মোরগের মতন ঝাপ্টাছে। কেউ যদি তাকে বাঁচাবার উদ্দেশে জলে ঝাঁপ দেয় তাহলে তারও প্রাণ শেষ। এমনটাই লোকমুখে শোনা যায়। এ রহস্যের কুল-কিনারা পাওয়া না গেলেও অনেকেরই ধারণা আত্মহত্যার পর অতৃপ্ত আত্মারা, যারা মুক্তি পায় না এই জায়গাই তাদের ঘাঁটি। যদিও এই প্রশ্নের সদুত্তর নেই। আছে শুধু লোক মুখে প্রচারিত ভয়ার্ত ঘটনার ধারা বিবরণী।

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

পার্ক হোটেল (২২৪৯৩১২১)
পিয়ারলেস ইন (২২২৮০৩০১)
অ্যাস্টর হোটেল (২২৮২৯৯৫০)
ফেয়ারলন হোটেল (২২৪৫১৫১০)
হোটেল রাত দিন (২২৪৭৬৯১১)
লিটন হোটেল (২২৪৯১৮৮১)
হোটেল শালিমার (২২২৮৫০৩০)
হোটেল আনন্দ ভবন (২২৩৭৪০১৪)

সংগীতচর্চায় কলের গান পেরিয়ে ইউটিউব ক্রেজ

আগের পাতার পর

কিন্তু হঠাৎ করে প্রযুক্তির চটজলদি উন্নতি এটিকেও আমাদের কাছে পুরোনো করে তুলেছে। এখন আর কোনও গান শোনার জন্যই আমাদের সিডি প্লেয়ারের দরকার হয় না। অবশ্য এর জন্য ইউটিউব, আইটিউনস বা ইন্টারনেট দায়ী নয়। আসলে সংগীত ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখন নতুন উন্নত প্রযুক্তিকে মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাছাড়া এফএম চ্যানেল বা আইপ্যাড ছেড়ে আজকের প্রজন্মের কেউই আর সিডি প্লেয়ারে ইন্টারেস্টেড নয়। এ ব্যাপারে গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য বেদনাহত হয়ে বলেছেন, 'আজকাল সিডি প্লেয়ার প্রায় বাজারে কিনতেই পাওয়া যায় না। গান শোনার কোনও যন্ত্র নেই। লোকে ল্যাপটপে, মোবাইলে গান শুনছে। আগে রেডিওতে পুজোর গান বা বেসিক বাংলা গান শোনা যেত। এখন এফএম চ্যানেলে শুধুই সিনেমার গান বাজে। আর সেখানে সাংঘাতিক প্রতাপ বলিউড-টলিউড প্রযোজকদের। যে প্রযোজক যত বেশি টাকা দেবে, তত বেশি তার ছবির গান বাজবে। এটাই এখন দস্তুর। আর এদের দ্বারাই বাংলা আধুনিক গান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে নতুন কিছু করার ইচ্ছে জাগে না।'

আবার অন্যদিকে কলকাতার রক-সম্রাট বাংলা ব্যান্ড 'ফসিলস'-এর রুপম ইসলাম বলছেন, 'সিডির আকারে গান না বেরোলেও কোনও ক্ষতি নেই। লোকজন ডিজিটাল মাধ্যমে গান শুনছে। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে গান। হন্যে হয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে গানের অ্যালবাম খুঁজতে হচ্ছে না।'

অতএব মাধ্যমগুলো তো আলটিমেটলি চেঞ্জ হওয়াই দরকার। আইটিউনসের মতো ডিজিট্যাল মাধ্যমগুলোতেও গান রিলিজ নিয়ে কোনও মন্দ কিছু দেখছেন না কলকাতার গায়কদের অনেকাংশই। বরং ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে এই সময় সংগীতচর্চা করার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হল টিনএজারদের খুব বড় ভাগটাই এর ব্যবহারকারী। আর তাছাড়া আইনি সাইটগুলোতে গান শুনলে শিল্পীরাও তাঁদের যোগ্য সাম্মানিক পান। পাইরেসি হওয়ারও কোনো ভয় থাকে না। তাই, উন্নতি প্রযুক্তি আমাদের ভবিষ্যতে আরও উন্নত পথ দেখাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমার চোখে কলকাতা | সঞ্জীব খান (সিনেমাটোগ্রাফার)

প্রথম পাতার পর

এর জন্য অবশ্যই আমরা দায়ী, আমাদের মানসিকতা দায়ী। আগের কলকাতার থেকে এখনকার কলকাতা অনেকটাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে, একে কসমেটিক ডেভেলপমেন্ট বলা যেতে পারে। ঝলমলে আলো ফ্লাইওভার শপিংমল মাল্টিপ্লেক্স হাইরাইজ পাঁচতারা হোটেল নাইটক্লাব এগুলো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মানসিকতার কতটা পরিবর্তন হয়েছে সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন আছে। কলকাতাকে চিনতে গেলে কলকাতার ছবি তুলতে গেলে রাতের কলকাতাকে দেখতে হবে। এখানে রাতের মধ্যে একটা আলাদাই ফ্লেভার আছে। প্রিয় সময় কাটানোর জায়গা যদি বলি তাহলে বলব অবশ্যই গড়ের মাঠ আকাশবাণীর পাশ দিয়ে ওই ট্রাম লাইন...প্রিন্সেপঘাট থেকে চক্ররেলে চেপে গঙ্গাকে পাশে রেখে যতটা যাওয়া যায়। কলকাতা কিন্তু হেঁটে ঘোরার শহর, কলকাতার বুকে অনেক গল্প অনেক ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ছবির ক্ষেত্রে কলকাতা কাউকে নিরাশ করে না। এখানকার সংস্কৃতি সাহিত্য গানবাজনা সবকিছু মিলেই কলকাতা। আমার কাছে কলকাতার গলিগুলোর মধ্যে নস্টালজিয়া আছে এখানে বারবার নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই কারণেই ক্যামেরাম্যানদের কাছে কলকাতা বরাবর প্রিয়।

আর একটা বিষয় না বললেই নয় কলকাতায় খুব সস্তায় খাবার-দাবার পাওয়া যায়, যেটা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় কি না জানি না। তবে এখানে জলনিকাশি ব্যবস্থায় সত্যিই সমস্যা আছে। আর হ্যাঁ ট্রাফিক জ্যাম। শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে পারি কলকাতায় এখন আর আগের মতো ফ্রিলি ছবি শ্যুট করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয়। পারমিশন থেকে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট। কলকাতার স্টুডিও ফেসিলিটি সেভাবে ডেভেলপ করেনি। এখনও ইন্ডাস্ট্রি টেকনিক্যালি অনেক পিছিয়ে। ভালো ছবি অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু তাকে প্রোমোট করার কেউ নেই। দিন দিন সিংগল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্যধারার কাজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। সেইদিক থেকে দেখলে খুব খারাপ একটা সময় চলছে। তার ওপর রয়েছে টেকনিশিয়ান গিল্ডের চক্কর, ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে এই চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা খুব আপত্তিকর আমার কাছে। কে কার সাথে কাজ করবে কতজনকে নিয়ে কাজ করবে সেটা সেই ক্রিয়েটিভ টিমের ব্যক্তিগত ব্যাপার এর ওপর গিল্ডের হস্তক্ষেপ আখেরে কিন্তু বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি করছে। যার ফলে এই সময়ের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেকনিশিয়ান এমনকী ফিল্মমেকারদের কাজ করতে বহু সমস্যা হচ্ছে। সর্বজনীনভাবে যদি বলতে হয় তবে বলতে হবে রাজনীতির কারবারি বলি বা নেতা-মন্ত্রী; তাঁরা যদি শহরের বাইরের অবয়ব ঠিক করার কথা যতটা ভাবছেন তার অন্তত কিছুটা যদি ভাবেন ভেতরের সমস্যার সমাধান নিয়ে, শহরটা আরও সুস্থ-স্বাভাবিক হতে পারে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৮ আগস্ট ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কলকাতা শহরটাই একটা বৈচিত্রের শহর

ফজলুক হক মিলন (নাট্যাভিনেতা)

আবহমানকালের স্রোতে একের পর এক পৃষ্ঠা উলটে যায়। সময় ইতিহাস হয়ে যায়। কিছু স্মৃতি তবু জ্বলজ্বল করে হৃদয়ের অন্তরে। কলকাতা আমার কাছে সেরকমই একটা স্মৃতি, সেরকমই ভালোলাগার মুহূর্তের একটা কোলাজ। আমার প্রথম কলকাতা আসার সময়টা ২০০৩ সাল। নাটকের জন্য বহুবার দেশ-বিদেশ ঘুরেছি। জাপানে গেছি, নরওয়ে গেছি, সিঙ্গাপুর গেছি। তবে ভারত, বিশেষত কলকাতায় যাবার ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণের ছিল। সে ভাষাগত দিক দিয়ে হোক আর কালচারগত দিক দিয়েই হোক। এমনিতেই এত গল্প কলকাতা সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে শুনেছি আর এখনও শুনছি যে না দেখলেও শহরটা সম্পর্কে একটা ধারণা মনে মনে তৈরিই হয়েছিল। একটা আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই ছিল। তাই যখন কলকাতায় যেতে হবে শুনলাম খুব আনন্দ হল। আমি এবং আমাদের পুরো টিমটাই খুব এক্সাইটেড ছিলাম।

নভেম্বরের ২২ তারিখ কলকাতা পৌঁছলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল শিয়ালদহ স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে। আমাদের ছাব্বিশ জনের নাটকের দল পাশাপাশি দুটো হোটেলে ছিলাম। প্রথম যখন পা রাখালাম কলকাতায় ঢাকার সাথে এর তেমন কোনও ফারাক খুঁজে পাইনি। যেদিন রাতে কলকাতায় এলাম পরের দিন শো গিরিশ মঞ্চে। আগেও অন্য দেশে শো করেছি তবে এখানের শো নিয়ে আমাদের মধ্যে উন্মাদনাই ছিল আলাদা। যতই তারের কাটা সীমানা টানুক না কেন, দুই বাংলার ভাষায় তো আর সীমানা টানা যায় না। কলকাতায় মুদি দোকানদার থেকে রিকশাওয়ালা, বিজনেসম্যান থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবার ভাষাই তো বাংলা। তাই অন্য দেশ ভাববার অবকাশ ছিল না।

শো শুরু হল। নাটক 'জন্মান্ধ'। হলে লোক উপচে পড়ছে। আমারাও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম আজ আমাদের সেরাটা দিতে হবে। নাটক চলছে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো নাটকের অন্তরঙ্গতায় হারিয়ে গেছেন। নাটকের শেষে দর্শকের সেই হাততালি পরেরদিনের সংবাদপত্রগুলোতে তার রিভিউ সত্যিই আমার জীবনে অমূল্য প্রাপ্তি। কারণ এই নাটকের মুখ্য চরিত্রে আমিই অভিনয় করেছিলাম।

পরের দুটো দিন আমাদের পুরো টিমটা কয়েকভাগে ভাগ হয়ে শহর ঘুরতে বেরোলাম। আমি আর আমার সাথে আরও চার বন্ধু, যেহেতু হোটেল থেকে কলেজ স্ট্রিট কাছে তাই কলেজ স্ট্রিটেই প্রথম গেলাম। অনেক চেনা কফি হাউসকে সেই প্রথম সামনে থেকে দেখা। তারপর সেখানে বসলাম। আড্ডা হল। ইনফিউশন খেলাম। কফি হাউসের একটা অন্যরকম পরিবেশ আছে। মনের ভেতর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভুতি তৈরি করে। কলেজ স্ট্রিট জায়গাটাই এমন, যে কোনও বইপ্রেমী মানুষের কাছে এটা বেহেস্তের চেয়ে কম কিছু নয়। সেখানে আর একটা দোকানের কথা এখনও মনে আছে। নাম ভুলে গেছি তবে সেই দোকানের সরবতের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

সেখান থেকে চলে গেলাম ধর্মতলা। গেলাম যাদুঘরে। পুরনো দিনের এত অ্যান্টিক জিনিসের সমাহার। সত্যিই অসাধারণ লেগেছিল। তারপর চলে গেলাম রবীন্দ্রসদন। সেখানে কলকাতার সদ্যপরিচিত কয়েকজন বন্ধুর সাথে আড্ডা হল সন্ধে অবধি। অ্যাকাডেমিতে একটা অসাধারণ নাটক দেখলাম। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় আজও স্মৃতিতে ফিকে হয়নি। পরের দিন সায়েন্স সিটি গেলাম দল বেঁধে। সেও এক অন্য অভিজ্ঞতা। মন ভালো করা একটা শহর এই কলকাতা। অলিতে-গলিতে দুপা এগোলেই ভিন্ন রূপ চোখে পড়বে। আদতে কলকাতা শহরটাই একটা বৈচিত্র্যের শহর। তারপরে আর যাওয়া হয়নি কখনও প্রিয় শহরটাতে, তবু এখনও স্পষ্ট কলকাতার সেই তিনদিনের স্মৃতি।

ফোটো: প্রীতম চক্রবর্তী

মহান বিপ্লবী বাঘা যতীন

প্রতীপ হালদার

'এত রক্ত ছিল শরীরে? ভাগ্যক্রমে, প্রতিটি বিন্দু অর্পণ করে গেলাম দেশমাতার চরণে।' বালেশ্বর সরকারি হাসপাতালে জীবনের শেষ সময়ে এসে যিনি একথা বলতে পারেন তিনি আর কেউ নন মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি 'বাঘা যতীন' নামেই বেশি পরিচিত। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের শৃঙ্খলমোচনের জন্য বাঘাযতীন এক পর্যায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রাম, ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ স্বাধীনতার ইতিহাসে এক উজ্জল অধ্যায়।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কয়া গ্রামে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। কিন্তু ঝিনাইদহ জেলায় পৈত্রিক বাড়িতেই তাঁর ছেলেবেলা কাটে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা এবং বড় বোন বিনোদবালার সাথে তিনি মাতামহের বাড়ি কয়াগ্রামে চলে যান আবার। শৈশব থেকেই শারীরিক শক্তির জন্য তাঁর সুনাম ছিল। শোনা যায়, তিনি নাকি শুধুমাত্র একটি ছোরা নিয়ে একাই একটি বাঘকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়ে যায় 'বাঘা যতীন'। সেইসময় বাঘা যতীন তাঁর মামার কাছে কৃষ্ণনগর শহরে অ্যাংলো ভার্নাকুলার (এভি) স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৫ সালে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পাশেই স্বামী বিবেকানন্দ থাকতেন। বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে শুরু করেন। এসময়ে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তাঁর বন্ধুদের দল নিয়ে এই রোগে আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত হন তিনি।

তখন ১৯০৩ সাল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের সাথে হঠাৎই পরিচয় হয়ে বাঘা যতীন প্রথম বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। সরকারি নথিপত্রে তিনি পরিচিত হন শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণহস্ত হিসাবে। অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বাঘা যতীন শরীর গঠন, আখড়ায় গাছে চড়া, সাঁতার কাটা ও বন্দুক ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর একের পর এক তিনি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সামিল হতে থাকেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষের সাথে একসঙ্গে বোমা তৈরির কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

এরপর ১৯০৭ সালে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে হুইলারের সচিবদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং-এ স্থানান্তরিত হন। সমস্ত উত্তর বাংলার মতো এখানেও তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সক্রিয় শাখা স্থাপন করেছিলেন। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মার্ফি ও লেফটেন্যান্ট সমারভিল সহ চারজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে তাঁর মারামারি হয় শিলিগুড়ি স্টেশনে। চারজনের চোয়াল ভেঙে ধরাশায়ী করে দেবার অপরাধে তাঁর নামে মামলা রুজু হলে সারাদেশে বিপুল আলোড়ন তৈরি হয়। কাগজে কাগজে এই নিয়ে লেখালিখির বহর দেখে সরকার চাপ দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করে। হুইলার একদিন ঠাট্টা করে বাঘা যতীনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, একা হাতে ক'টা লোককে আপনি শায়েস্তা করতে পারেন?' হেসে যতীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভালো মানুষ হয় যদি, একটাও নয়। দুর্বৃত্ত হলে যতগুলি খুশি সামলাতে পারব।' এইসময় জেলার সুবিদিত অস্ত্র-ব্যবসায়ী নূর খাঁ-র কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কিনে যতীন্দ্রনাথ নিয়মিত বাদা অঞ্চলে গিয়ে নির্বাচিত কর্মীদের তালিম দিতে লাগলেন। আলিপুর বোমার মামলার অভিযুক্ত বিপ্লবীদের ব্যয়ভার বহন, অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও তিনি গণচেতনায় প্রত্যয় জাগাতে দুর্ধর্ষ কিছু পরিকল্পনা করেন। ১৯০৮ সালের ২ জুন থেকে ধাপে ধাপে এই অভিযান ইংরেজ সরকারের কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠল।

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে ১৯১০ সালের ২৭ জানুয়ারি যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হল। শুরু হল হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা। বেশ কিছুদিন পর আবার ছাড়া পান তিনি। সেই মুহূর্তে বার্মা সীমান্তেও সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে বলে। দূরপ্রাচ্যে জার্মান দূতাবাস ও কনস্যুলেটসহ অনেকেই সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিল। এইসময় সমাগত 'গদর' কর্মীরা কাজে নামতে চান, জার্মান অস্ত্র আসার জন্য তাঁদের তখন তর সইছে না। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে রাসবিহারী বসু দিন ধার্য করলেন ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের জন্য।

ব্রিটিশ সৈনিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের অংশ হিসাবে জার্মানি থেকে ম্যাভেরিক নামে একটি জাহাজে অস্ত্র আসছিল। সেই অস্ত্র জাহাজ থেকে নামিয়ে আনতে বাঘা যতীন তাঁর চারজন বিশ্বস্ত সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্র দাশগুপ্তকে সাথে নিয়ে ওড়িশার বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করেন। জার্মানি থেকে ম্যাভেরিক জাহাজে আসার খবর বিশ্বাসঘাতকার ফলে ব্রিটিশদের কাছে পৌঁছে যায়। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি সদলবলে যখন বুড়িবালাম নদী পার হন, তখন পুলিশের বিরাট বাহিনী সারা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। একদিকে পাঁচজন অসমসাহসী বঙ্গসন্তান, অন্যদিকে ব্রিটিশের বিশাল পুলিশবাহিনী। বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এমন অসম যুদ্ধের তুলনা বিরল। একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ঘটনাস্থালেই প্রাণ দেন চিত্তপ্রিয়, পরদিন হাসপাতালে প্রাণ দেন মহাবিপ্লবী বাঘা যতীন। অন্যদের পরে ব্রিটিশরা ফাঁসি দেয়।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের আত্মবলিদান সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এতকালের পরাধীন দেশে এ মৃত্যু ছোট নয়।'